মানববিদ্যা গবেষণাপত্র পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৯ ॥ জুলাই ২০২২ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

কাজী নজরুল ইসলামের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের জীবন: প্রসঙ্গ *রাক্ষুসী* ও *অগ্নি-গিরি*

তুহিন অবন্ত*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: সমকালে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। বাংলা সাহিত্যের বিষয়াবহেও নিম্নবর্গের জীবন ও বাস্তবতা নিয়ে কিছু গবেষণা প্রত্যক্ষ করা যায়। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি যেমন রয়েছে তেমনই এ বর্গের প্রভাবও সুস্পষ্ট। বিশেষত তাঁর গল্প ও উপন্যাসে এই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কাজী নজরুল ইসলামের গল্পের যে জীবন ও বাস্তবতা তার পটভূমিতে নিম্নবর্গীয় তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করলে উপর্যুক্ত সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় কাজী নজরুল ইসলামের *রাক্ষুসী* ও *অগ্নি-গিরি* গল্প আধেয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ গল্পদ্বয়ে যে জীবনচিত্র মূর্ত হয়েছে তা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির স্বরূপ উদঘাটন বর্তমান গবেষণামূলক প্রবন্ধের মৌল লক্ষ্য। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়স্থানে বিকাশ লাভ করা নিম্নবর্গ সংক্রান্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। নির্বাচিত গল্পদ্বয়ে নজরুল সৃষ্ট নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলি সনাক্তকরণ, তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ভাষা, বিশ্বাস-বোধ, আচার-আচরণ, সামষ্টিক চেতনা প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ গবেষণায় পর্যালোচনার প্রয়াস রয়েছে। গল্পদ্বয় হতে যে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তর-কাঠামো বর্তমান প্রবন্ধে উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নবর্গের ইতিহাসের এক খণ্ডাংশ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী শাখা হিসেবে ছোটগল্পকে বিবেচনা করা হয়। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে এই শাখাটির বিস্তৃতি ঘটতে শুরু করে। (চট্টোপাধ্যায় ২০১২: ১৭) ছোটগল্পে যে ভাবের ব্যঞ্জনা থাকে তা কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সৃজন নৈপুণ্যে পেয়েছে স্বতন্ত্র মাত্রা। অথচ

* মো. তুহিনুর রহমান (তুহিন অবন্ত), চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সহকারী অধ্যাপক, ফিল্ম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

সমালোচকমহলে গল্পকার পরিচয়ে কাজী নজরুল ইসলাম যতটা সমাদৃত তদুপেক্ষা গীতিকার, সুরকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক কিংবা শিল্পের অন্যান্য শাখায় বিচরণকারী হিসেবে জনপ্রিয় ও আলোচিত। কাজী নজরুল ইসলামের গল্পগ্রন্থ মাত্র তিনটি। তাঁর জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সর্বমোট গল্প সংখ্যা আঠারোটি।[১] গবেষকের মতে অগ্রন্থিত গল্প সংখ্যা একটি, মতান্তরে দুইটি।[২] বক্ষ্যমান গবেষণায় আধেয় হিসেবে দুইটি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে; যথা: *রাক্ষুসী* ও *অগ্নি-গিরি*। নির্বাচিত দুইটি গল্পই গ্রন্থবদ্ধ হবার পূর্বে "সওগাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। *রাক্ষুসী* প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সনের মাঘ মাসে আর *অগ্নি-গিরি* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে।[৩] নির্বাচিত গল্পদ্বয়ে যে জীবনচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তার সামাজিক বাস্তবতা পাঠ বর্তমান প্রবন্ধের অভীষ্ট। এ হেতু প্রথমেই গল্প দুইটির আখ্যানের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলা শহরের নাম বীরভূম। এ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক বাগদী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এই বাগদীদের জীবনাচারের গল্প বর্ণিত হয়েছে *রাক্ষুসী* গল্পে। আত্মকথন রীতিতে বিন্দি নামক এক বাগদী নারী গল্পটি বয়ান করে। আত্মকথনটি পরিণত হয়েছে বিলাপে। বিন্দি তার কথিত বোন মাখনকে নিজের দুঃখ ও কষ্টের কথা জানাচ্ছে। বিন্দির তিন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে পাঁচু। তারপর দুইটা মেয়ে। স্বামী হত্যার দায়ে কয়েকবছর জেল খেটে ফিরে এসেছে বিন্দি। এসে দেখে পাঁচু বিয়ে করেছে। মেয়েদেরকে বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে বিন্দি, কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না। গ্রামের যে মানুষটি বিন্দিকে দেখে সেই 'রাক্ষুসী' ভেবে সরে যায়। বাগদী সমাজে বিন্দি সনাক্ত হয় 'রাক্ষুসী' নামে। বাগদী সমাজের পুরুষরাও বিন্দিকে ভয় পায়, নারী ও শিশুরাও একইরূপ আচরণ করে। গ্রামবাসী ক্রমেই বিন্দিকে ক্ষেপিয়ে তোলে। বাগদী সমাজ পাচুকে একঘরে করে। কাজেই বিন্দি, পাঁচু, পাঁচুর বউ আর বিন্দির মেয়েদ্বয় গ্রামের অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শ পায় না। জেল থেকে ফিরে এসে এভাবে দুইবছর কাটিয়ে দেয় বিন্দি। কিন্তু গ্রামের সামাজিক অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ও সম্পর্কের উন্নয়ন হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দি তার কষ্টের কথা বলছে মাখন নামক এক বোনকে। এই কথনই গল্প বর্ণনার রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। কথন থেকে জানা যায় বিন্দির অতীত।

[১] নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত *নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র* (২০০৯)-তে কাজী নজরুল ইসলামের উনিশটি গল্প লভ্য। উপর্যুক্ত গ্রন্থের 'তৃতীয় সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা' অংশে ইতপূর্বে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের সর্বমোট গল্প আঠারোটি বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

[২] নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত *নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র* (২০০৯) গ্রন্থের 'নবম মুদ্রণের প্রসঙ্গ-কথা' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাজী নজরুল ইসলামের অগ্রন্থিত গল্প একটি। কিন্তু বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *নজরুল রচনাবলী* (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ)-এ কাজী নজরুল ইসলামের অগ্রন্থিত গল্প দুইটি উল্লেখ করার তথ্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

[৩] নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত *নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র* (২০০৯) এর 'গ্রন্থ ও রচনা-পরিচিতি' অংশ হতে প্রাপ্ত তথ্য।

স্বামী আর তিন সন্তান নিয়ে একদা সুখে ছিল বিন্দি। আচমকা একদিন পার্শ্ববর্তী পাড়ার রঘো বাগদীর মেয়ের সাথে স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কের কথা জানতে পারে বিন্দি। এই নিয়ে দাম্পত্য কলহ হয়। বিন্দি স্বামীকে ঝাটাপেটা করে আর স্বামী তাকে চেলাকাঠ দিয়ে প্রহার করে। কিন্তু স্বামীর পরকীয়া বন্ধ করতে পারে না বিন্দি। অধিকন্তু সংসারে বিন্দির সঞ্চয়কৃত অর্থও নিয়ে যায় স্বামী। এরপর আবারও স্বামী-স্ত্রীতে মারামারি হয় । অতপর বিন্দি স্বামীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। একদিন বৃষ্টিস্নাত দিনে স্বামীকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সে। হত্যার পর বিন্দির সাত বছরের জেল হয়। শিউড়ি শহরের জেলখানায় থাকে সে। কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যেই দিল্লির প্রশাসকের পরিবর্তন হওয়ার দরুণ অপরাপর আসামীর সাথে বিন্দিও হঠাৎ করে মুক্তি লাভ করে। মুক্ত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না সে। উপরন্তু নিজের তথাকথিত রাক্ষুসী প্রতিমূর্তির কারণে পরিবোরের অন্যরাও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বিন্দি বিলাপ করছে মাখনের উদ্দেশ্যে। বিন্দির বিলাপেই শেষ হয় গল্পের আখ্যান।

অগ্নি-গিরি গল্পের আখ্যানের বিস্তৃতি ঘটেছে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার দরিরামপুর নামক একটি গ্রামের প্রেক্ষাপটে। গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তা আলি নসিব মিঞা। আলি নসিবের পরিবারে আছে স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা নূরজাহান। এই পরিবারে সবুর আখন্দ নামক এক যুবক জায়গীর থাকে। সবুর মাদ্রাসায় পড়ে আর গৃহকর্তার মেয়ে নূরজাহানকে উর্দু পড়ায়। সবুর স্বভাবে খুবই শান্তশিষ্ট। কিন্তু এই পাড়ায় রয়েছে কতিপয় দুরন্ত যুবকদের উৎপাত। যুবকদলের সর্দারের নাম রুস্তম। রুস্তম এবং তার সহযোগীরা সময় ও সুযোগ পেলেই সবুরকে উত্যক্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বাক্যবাণ থেকে শুরু করে শারিরীক নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে সবুরকে নাজেহাল করে তোলে দুরন্তপনা যুবকেরা। ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করে নূরজাহান। সে পিতার নিকট বিচার দাবী এবং সবুরকে তিরষ্কার করে। তথাপি সবুর নিজের শান্ত ভাব বজায় রাখে। শান্ত ও মায়াময় ভাব ব্যঞ্জনার দরুণ সবুরের প্রেমে পড়ে নূরজাহান। দুরন্তপনা যুবকদের প্রতিহত করবার নিমিত্তে সবুরের পৌরুষ-দীপ্ত শক্তি জাগ্রত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে নূরজাহান। সবুরকে অপমান করে সে। একপর্যায়ে সবুর প্রতিজ্ঞা করে রুস্তম ও তার সহযোগীদের উচিৎ শিক্ষা দিবে। এরপর রুস্তম ও তার সহযোগীরা পুণরায়ায় সবুরকে উত্যক্ত করতে গেলে সবুর প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ রূপ নেয় প্রতিরোধে। অনন্তর ঘটনা রূপ নেয় হাঙ্গামাতে। রুস্তমকে পুকুরের জলে ফেলে দেয় সবুর। এক পর্যায়ে রুস্তমের সহযোগী আমির ছুরি নিয়ে সবুরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সবুরের পাল্টা আক্রমণে সে ছুরি আমিরের বুকে বিঁধে যায়। মৃত্যু হয় আমিরের। অতঃপর বিচারে সাত বছরের জেল হয় সবুরের। আলি নসিবের পরিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সবুরকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। গ্রামেও আলি নসিবের সামাজিক অবস্থান হেয় হয়। এমতাবস্থায় আলি নসিব মিঞা তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি বিক্রয়উত্তর পরিবার নিয়ে দেশান্তর হতে তৎপর হন। নূরজাহানের কাছে বীর রূপ

প্রকাশ হওয়ায় জেলের অভ্যন্তরে থেকেও সবুরের মনে প্রশান্তি দেখা দেয়। অন্যদিকে গল্প অন্তে প্রেমিকের এরূপ পরিণতিতে নূরজাহানের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

লক্ষণীয় হলো, নির্বাচিত গল্পদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষপটে রচিত হয়েছে। *রাক্ষুসী*র সকল চরিত্র বীরভূমের বাগদী সম্প্রদায় থেকে নেওয়া হয়েছে। বাগদীদের সমাজ বাস্তবতা মূর্ত হয়েছে গল্পটিতে। প্রসঙ্গক্রমে বাগদী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সম্যক ধারণা আবশ্যক। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রকাশিত *বাংলাপিডিয়া*তে বাগদী সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "বাগদী দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত নিম্নশ্রেণির কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, এদের মধ্যে আদিবাসীসুলভ নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।" (সম্পা. ইসলাম ২০০৩: ৩১৩) অন্যত্র গবেষক লিপিকা রাণী বড়ুয়া জানিয়েছেন যে, বাগদীরা বর্গক্ষত্রিয়। দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত এই জাতিগোষ্ঠীর প্রধান বাসস্থান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি জেলায় প্রচুর সংখ্যায় বাগদীরা বাস করেন। (বড়ুয়া ২০১৯: ২৪) এদের ভাষা বাংলা। ২০০১ সালের জনগননা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বাগদীদের সংখ্যা ২,৭৪০,৩৮৫। এরা রাজ্যের তফসিলি জাতি জনসংখ্যার মোট ১৪.৯ শতাংশ। (শাহিদুর রহমান শাহিদ 'ডেইলি বাংলাদেশ' ২০০১: ৪) ১৯৯৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এক গেজেটেও একইরূপ তথ্য পাওয়া যায়। (বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেট ১৯৯৬: ৪১) আবার গবেষক শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রদত্ত তথ্য মতে, বাংলার প্রায় সকল জেলায় অল্পবিস্তর বাগদীদের বসবাস রয়েছে। তবে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনিপুর, ২৪ পরগণা, হুগলি, হাওড়া জেলায় বাগদীদের আধিক্য দেখতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া ও বর্ধমান ইহাদের পূর্বসুরীদের বাসস্থান। বীরভূম হচ্ছে বর্ধমানের অন্তর্গত জেলা। বাগদীদের পেশা সম্বন্ধে শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ উল্লেখ করেছেন:

> বাগ্‌দিরা প্রথমে কী কাজ করিতেন তাহা জানিতে পারা যায় না। এখন ইঁহারা মাছ ধরেন, চৌকিদারের কর্ম করেন, পালকি বহন করেন, চাষবাস করেন, চুণ তৈরি করেন। দুলেরা সাধারণত ডুলি পালকি বহন করেন, মাছ ধরেন, তেঁতুলে ও কুশমেটেরা রাজমজুরের কাজ করেন, চুণ তৈরি করেন, কেহবা কাপড় বোনেন। হোলী উৎসবে আবির তৈরি করাও ইঁহাদের পেশা। (ঘোষ ২০০৬: ৯১)

উল্লেখ্য বাগদীদের মধ্যে চারটি উপশ্রেণি রয়েছে যথা: তেঁতুলে, দুলে বা ডুলে, কুশমেটে ও ক্ষেত্রী বা মেটে। উপর্যুক্ত বক্তব্য মতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, বাগদীরা নৃতাত্ত্বিকভাবে দ্রাবিড় ও ক্ষত্রিয়জাত এবং সামাজিক অবস্থানে নিম্নশ্রেণির।

অগ্নি-গিরি গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের জনজীবনকে কেন্দ্র করে। গল্পে গ্রামটির নাম উল্লিখিত হয়েছে বীররামপুর নামে। কিন্তু নজরুল গবেষকদের ধারণা ত্রিশালস্থ দরিরামপুর নামক যে গ্রামে কাজী নজরুল বাল্য বয়সে কিছুদিন ছিলেন সেটিই এ গল্পের পটভূমি। গল্পে ত্রিশাল ও ময়মনসিংহ এর উল্লেখ এবং ভাষার ব্যবহারের দরুণ গবেষকদের উপর্যুক্ত

ধারণা সহজেই প্রমাণিত হয়েছে। *অগ্নি-গিরি* গল্পে সবুর আখন্দের পূর্বসুরীকে সম্ভ্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু গল্পে যে সবুর বর্তমান সে আলি নসিবপের পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। আলি নসিবের পরিবারের যে আর্থসামাজিক অবস্থা গল্পে বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণত নিম্নশ্রেণির বলে মনে হয় না, আবার উচ্চবিত্তও নয়। *রাক্ষুসী* গল্পের বাগদী সম্প্রদায় এবং *অগ্নি-গিরি*'র সবুরসহ অন্যান্য চরিত্রের আর্থসামাজিক উপর্যুক্ত রূপের পরিপ্রেক্ষিতে 'নিম্নবর্গ' এর প্রত্যয়গত ধারণার বিশ্লেষণ আবশ্যক।

রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তর বিন্যাসের একটি ভাগ হলো নিম্নবর্গ। ঔপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের ইতিহাসকে ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার তাগিদে দুনিয়াজুড়ে নিম্নবর্গ তত্ত্বের বিস্তার ঘটেছে। নিম্নবর্গের ইতিহাসকে বলা যায় ইতিহাস পাঠের স্বতন্ত্র এক ধারা। ইংরেজি subaltern শব্দের পরিভাষা হিসেবে বাংলায় "নিম্নবর্গ" শব্দটি ব্যবহার করেন সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা রণজিৎ গুহ (১৯২২-)। তবে অধুনা বিভিন্ন অভিধানে সাব-অল্টার্ন কিংবা "নিম্নবর্গ" শব্দটির যে অর্থ করা হয়েছে বাস্তবিক অর্থে সে সকল অর্থের মধ্যে নিম্নবর্গের তাৎপর্য আর সীমিত নেই। নিম্নবর্গের জীবন ও সভ্যতার ইতিহাসের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান এবং তৎসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখার উদ্ভব হয়েছে যা সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ (subaltern studies) নামে পরিচিত।[*] অধুনা বিভিন্ন অভিধানে সাব-অল্টার্ন শব্দের যে অর্থ বিধৃত হয়েছে তার দিকে আমরা দৃষ্টি দিতে পারি। বিভিন্ন অভিধানে সাব-অল্টার্ন বা নিম্নবর্গ শব্দের যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে শব্দটির তাৎপর্য হয় নিম্নরূপ:

ক. পদমর্যাদায় নীচু স্তরের মানুষ
খ. সামাজিক বা পেশাগত অবস্থানের দিক থেকে নিম্নশ্রেণির
গ. অধস্তন, অপ্রধান ও গৌণ জনগোষ্ঠী
ঘ. পদ/পদবী কিংবা চাকরিগত অবস্থানে অধস্তন ব্যক্তিবর্গ কিংবা নিম্নশ্রেণির চাকুরিজীবী
ঙ. সামাজিক বা পেশাগত অবস্থানের দিক থেকে অধস্তন
চ. যোগ্যতা কিংবা গুরুত্বের দিক থেকে উপেক্ষিত কিংবা গুরুত্বহীন
ছ. মর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ক্রিয়াগত দিক থেকে গৌণ বা অপ্রধান[**]

* Subaltern Studies Group (SSG) or Subaltern Studies Collective is a group of South Asian scholars interested in the postcolonial and post-imperial societies which started at the University of Sussex in 1979–80. The term Subaltern Studies is sometimes also applied more broadly to others who share many of their views and they are often considered to be "exemplary of postcolonial studies" and as one of the most influential movements in the field. Their anti-essentialist approach is one of history from below, focused more on what happens among the masses at the base levels of society than among the elite. (Raewyn Connell *Southern theory: The global dynamics of knowledge in social science* 2007 : 12)

** ক) Concise Oxford English Dictionary (1999)

সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর প্রধান উদ্যোক্তা রণজিৎ গুহ (১৯২৩-)। রণজিৎ গুহ সম্পাদিত *Subaltern Studies* গবেষণা পত্রিকা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নিম্নবর্গ সংক্রান্ত জ্ঞানের দুয়ার বিস্তৃত করেছে এবং পরবর্তীতে এ গোষ্ঠী রচিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থের প্রভাবে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ব্যাখ্যায় জন্ম নিয়েছে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি। নিম্নবর্গের সংজ্ঞা নিরূপণে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর অভিমত হলো:

> The term 'subaltern' is used to denote the entire people that is subordinate in terms of class, caste, age, gender and office, or in any other way. (*Sen* 1987: 203)

কাজেই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোন সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে বা মর্যাদার দিক থেকে যারা নিম্নস্থিত তারা যেমন নিম্নবর্গ, তেমনই নিম্নবর্গ হবে পরাধীন জনগোষ্ঠী; আবার সমাজের অভ্যন্তরে যে গোত্র, ধর্ম, পেশা, প্রতিষ্ঠান তথা ভাবাদর্শগত বিষয় রয়েছে তার ভেতরও যারা নিম্নস্থিত, অধীন এবং অপাঙ্‌ক্তেয় তারাও নিম্নবর্গ। উল্লিখিত নিম্নবর্গের বিপরীত পার্শ্বে যে সকল মানুষের বাস তাদেরকে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজে উচ্চবর্গীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহলে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, শ্রেণি, জাতি-বর্ণ, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পেশাগত অবস্থানের দিক থেকে যারা প্রাধান্য ভোগ করে তারা উচ্চবর্গ; আর উচ্চবর্গের অধস্তন হচ্ছে নিম্নবর্গ। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দুই বর্গকেই পৃথক করে দেখা হচ্ছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, গুরুত্বহীন ও ক্ষমতাহীন হিসেবে সমাজের তলানিতে নিম্নবর্গের অবস্থান হলেও এরা কিন্তু সমাজ কাঠামোর বাইরে নয়।

রাক্ষুসী গল্পে বাগদীদের যে জীবনাচার বর্ণিত হয়েছে তা মূলত সমাজের তলানির চিত্র। ইতপূর্বে উল্লিখিত বাগদীদের যে পেশার কথা শৌরীন্দ্রকুমার বলেছেন তা পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলোচ্য *রাক্ষুসী* গল্পে যে সকল চরিত্র রয়েছে তাদের একটি বর্গভিত্তিক তালিকা নিম্নে সারণি আকারে উপস্থাপন করা হলো:

Subaltern: n. an officer in the British army below the rank of Captain, especially in second lieutenant. adj. of lower status.

খ) Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (2000)
noun. any officer in the British army who is lower in rank than a Captain.

গ) The New Samsad English Bengali Dictionary (2001)
গ. ১. শ্রেণি, জাতপাত, বয়স, লিঙ্গ, পদ বা অবস্থান বা অন্য যে-কোনো পরিচয়ে প্রাধান্যভোগী কোনো বর্গের অধঃস্থ, নিম্নবর্গ।
গ. ২. সমাজবিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ ধারা বা ঘরানার অন্তর্গত; এই ধারার সমাজবিজ্ঞানীগণ নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের অভিজ্ঞতা তথা বোধ বা অনুভবের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস আলোচনায় নিয়োজিত।

ঘ) Bangla Academy English-Bengali Dictionary (2008)
ক্যাপ্টেনের চেয়ে নিম্নপদস্থ সনদপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা; অধস্তন অফিসার।

সারণি-১

গল্পে উল্লিখিত নিম্নবর্গীয় চরিত্র ও তাদের বয়স	গল্পে উল্লিখিত উচ্চবর্গীয় চরিত্র ও তাদের বয়স	অনুল্লিখিত চরিত্র
বিন্দি (৩৫), বিন্দির স্বামী (৩৫), পাঁচু (২০), বিন্দির কন্যা-১ (১৮), বিন্দির কন্যা-২ (১৬), মাখন (৩৬), রঘো বাগদীর কন্যা (২০)	উচ্চবর্গীয় কোন চরিত্র নেই।	রঘো বাগদী, দারোগা, বিচারক, বাগদী পাড়ার মানুষ, গ্রামবাসী, প্রমুখ।

লক্ষণীয় যে, *রাক্ষুসী* গল্পে কোন উচ্চবর্গীয় চরিত্র নেই। নিম্নবর্গীয় চরিত্রদের জীবনের নানাবিধ ঘটনাকে ভাবের ব্যঞ্জনায় লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। বাগদীরা যে নিম্নবর্গ এটা প্রথমত প্রমাণিত হয় পেশার পরিচয়ে। ঐতিহাসিকভাবে শৌরীন্দ্রকুমারের বর্ণনার সাথে গল্পে উল্লিখিত বাগদীদের পেশার খুব একটা অমিল চোখে পড়ে না। বিন্দির স্বামীর চাষাবাদ করার কথা জানা যায়। বিন্দির ভাষায়:

> আমার সোয়ামি ছিল সাদাসিধে মানুষ, সে ত সোজা ছাড়া বাঁকা কিছু জান্‌ত না। সে চাষ ক'রত, কির্‌ষাণি ক'রত, আমি সারাটি দিন মাছ ধ'রে চাল কেঁড়ে, ধান ভেনে' আনতুম। তা না হ'লে চলবে কি ক'রে দিদি? (ইসলাম ২০০৯: ১৩২)

বাগদী পুরুষ কর্তৃক মাটি কাটার কথাও আলোচ্য গল্পে জানা যায়। চাষাবাদ করা, মাটি কাটা কিংবা মাছ ধরার এই কর্মসমূহ জানান দেয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীর অর্থনৈতিক বাস্তবতার। এই পেশায় যে উপার্জন তা দিয়ে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ মেটানোই মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু নিম্নবর্গীয় বাগদীদের চাহিদা একেবারেই সীমিত। সারাদিনে একবার কিংবা দুইবার একটু খেতে পারলেই তারা সন্তুষ্ঠ থাকে এবং আরামের ঘুম দেয়। বিন্দির পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং চাহিদার পরিমিতি সম্বন্ধে গল্পে উল্লেখ পাওয়া যায়। গল্পের ভাষায়:

> আমাদের সংসারে ত অভাব ছিল না কোন কিছুর, তোদের পাঁচজনের আশীর্বাদে। এই বিন্দিই তখন নাই নাই ক'রে দিনের শেষে তিনটি সের চাল তরকারির জন্য মাছ রে, শামুক রে,গুগলি রে পিত্থিমির জিনিস ক'রে আন্‌ত, তাছাড়া বড় ছেলেটাও তোমাদের শীচরণের আশীর্বাদে ক'রে কর্মে দু'পয়সা ঘরে আনছিল। মেয়েটাও পড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে যা দু'চারটে শাগ-মাছ আন্‌ত, তাতেও নেহাৎ কম পয়সা হ'ত না। লুন-তেলের খরচটা ওর দিয়েই বেশ দিব্যি চলে যেত। এ সবের উপর সোয়ামি বছরের শেষে চাষবাস আর কিরষাণি ক'রে যা ধান-চাল আন্‌ত, তাতে সারা বছর খুব 'সচল বচল' ক'রে খেয়েও ফুরাত না। সংসারের তখন কি ছিরিই ছিল। লক্ষী যেন মুখ তুলে চেয়েছিলেন। (ইসলাম ২০০৯: ১৩২)

বিন্দির উপর্যুক্ত সংলাপ হতে তার পরিবারের চাওয়া ও পাওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। অল্পতেই তুষ্ট এই বাগদীরা কেবল খাওয়া, ঘুমানোর স্থান আর সামান্য

পোশাক পেলেই খুশি থাকে। রুচির বাছ বিচার কিংবা অতৃপ্তি এদের নেই। অর্থের প্রতি মোহ দেখা যায় না। বিন্দির ভাষায়, তার মাটির ঘরই আনন্দে ইন্দিরপুরী হয়ে উঠেছে। আর্থসামাজিক এই পটভূমিতে গল্পের প্রধান চরিত্র বিন্দি ও তার পরিবারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সঞ্চারিত হয়েছে। আর্থসামাজিক বাস্তবতায় তাই বিন্দির পরিবারের সকলে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি। পেশা এবং আর্থসামাজিকতায় নিচু স্তরের মানুষকে বাংলা ভাষায় বহুকাল ধরে অন্ত্যজ, ব্রাত্য ও দলিত বলার প্রচলন লক্ষ করা যায়। আমাদের স্মরণ রাখতে হয় যে, বাংলা ভাষায় নিম্নবর্গ শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে আধুনিক কাল পর্বে। আর বহুকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'অন্ত্যজ' শব্দের যে অর্থ রয়েছে তা ক্ষেত্রবিশেষে নিম্নবর্গের সমার্থক। বাংলা ভাষার অভিধানে অন্ত্যজকে চিহ্নিত করা হয়েছে নীচ বংশজাত, অস্পৃশ্য, অন্তিম, চণ্ডাল, শূদ্রকুলজাত প্রভৃতি অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে। (শরীফ ২০০৭: ১৭) আবার 'দলিত' শব্দের অর্থও নিম্নবর্গের সমার্থক। দলিত অর্থ হচ্ছে দলন করা হয়েছে এমন, মর্দিত, পিষ্ট, হরিজন, উৎপীড়িত, নিপীড়িত। বাংলা ভাষায় দলিত বলতে ভারতের শোষিত ও নির্যাতিত পশ্চাৎপদ শ্রেণিসমূহকে বোঝানো হয়েছে। (শরীফ ২০০৭: ২৭৩) 'ব্রাত্য' শব্দটির অর্থও কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের সমার্থক হয়েছে। শব্দটির অর্থ করা হয়েছে পতিত, সংস্কারহীন, ব্রতভ্রষ্ট ও আচারভ্রষ্ট। (শরীফ ২০০৭: ৪২৯) বাঙালি ও বাঙলার সংস্কৃতিতে নিম্নবর্গের প্রত্যয়গত দিক ও তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে কেবল subaltern শব্দের পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেই চলে না; অন্ত্যজ, দলিত কিংবা ব্রাত্য শব্দের তাৎপর্যও পর্যবেক্ষণে নিতে হয়। একারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির পটভূমিতে নিম্নবর্গকে পর্যালোচনা করা দরকার।

ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় প্রাচীনকাল থেকেই রয়েছে বর্ণভেদ। ভারতের হিন্দু সমাজ ছিল চারবর্ণে বিভক্ত, এই চতুবর্ণ যথাক্রমে: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। বর্ণপ্রথার প্রমাণপত্র প্রথম পাওয়া যায় ভারতীয় সমাজের প্রাচীণতম ধর্মগ্রন্থ *বেদ*-এ। খ্রিষ্টের জন্মের হাজার বছর পূর্বে রচিত *ঋগ্বেদ*-এর পুরুষ সূক্তে কল্পনা করা হয়েছে এক বিরাট পুরুষের। এই পুরুষের রয়েছে সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ। এই পুরুষ সকলের আগে জন্মেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপ্ত করা হয়। এই পুরুষ থেকেই চতুর্বর্ণ সম্বলিত মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। বেদ-এ উল্লেখিত রয়েছে:

> পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হলো।...এর মুখ ব্রাহ্মণ হলো, দু বাহু ক্ষত্রিয় হলো, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হলো, দু চরণ হতে শূদ্র হলো। মন হতে চন্দ্র হলেন, চক্ষু হতে সূর্য, মুখ হতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হতে বায়ু। নাভি থেকে আকাশ, মস্তক থেকে স্বর্গ, দুই চরণ হতে ভূমি। কর্ণ হতে দিক ও ভুবন সকল নির্মাণ করা হলো। (দত্ত ২০০৭: ৫৮৭)

কোন কোন বৈদিক সাহিত্য বিশেষজ্ঞের মতে, *বেদের* এই সুক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত; কেননা *ঋগ্বেদের* অন্য কোন অংশে চতুর্বর্ণের আর উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগের পূর্বে বর্ণভেদ ছিল কি না তা নিয়ে বৈদিক সাহিত্য বিশেষজ্ঞদের

রয়েছে আরও মতভেদ। কারও মতে, *বেদ* রচনার সময় আর্যদের মধ্যে কোন বর্ণভেদ ছিল না। পরবর্তীতে আর্যরা এক বর্ণের ওপর আরেক বর্ণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই উপরে উল্লিখিত সূক্ত সংযুক্ত করেছিলেন।[৪] পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদের প্রথম প্রমাণ হিসেবে এখনও দেখা হয় *বেদকে*। বেদের পরে *রামায়ণ*, *মহাভারতে*ও বর্ণপ্রথার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুবর্ণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হচ্ছে উচ্চবর্ণ আর শূদ্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে নিম্নবর্ণ হিসেবে। *রামায়ণ* এবং *মহাভারত* শূদ্রদের সৃষ্টি এরূপ মত কোনও কোনও গবেষক দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই মহাকাব্যদ্বয়ে শূদ্রদের নিম্নবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে বিধি-নিষেধ। (শর্মা ২০১৩: ২৯১-২৯৩) শূদ্রদের নিম্নবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে উচ্চবর্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন *মহাভারতের* কবি। *মহাভারতে* উল্লেখ করা হয়েছে: "যিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন তিনি পৃথিবীর যা কিছু ঘৃণ্য তাই ভোজন করেন, মানুষের শরীর পরিত্যাজ্য অংশ পান করেন ও পৃথিবীর সব আবর্জনা আহার করেন।" (বসু ২০০৯: ৫৪৬) *মহাভারতের* মতো *গীতাতে*ও চতুবর্ণ নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এবং নিম্নবর্ণ হিসেবে শূদ্রদের অন্ত্যজ শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "মানুষের চরিত্রে যতপ্রকার দোষ থাকতে পারে সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। জন্মান্তরীয় পাপের ফলে জীব স্ত্রীরূপে (শূদ্ররূপেও) জন্মগ্রহণ করে।" (শাস্ত্রী ২০১৬: ৩৫৬) লক্ষ্যণীয় হলো, শূদ্র জন্মগতভাবেই নিম্নবর্ণের। চতুবর্ণের অন্য বর্ণসকলও জন্মগতভাবে নিজ নিজ রূপ ধারণ করেছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের বদৌলতে এক বর্ণের আরেক বর্ণে রূপান্তরিত হওয়ার ইতিহাস রয়েছে।[৫]

৪. কোনো কোনো বৈদিক সাহিত্য বিশেষজ্ঞের ধারণা ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত। সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের ভাষা থেকে এই সুক্তের ভাষা আলাদা, যা সময়ের বিচারে আধুনিক। তাছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে স্রষ্টা তাকে বলির পশুরূপে অগ্নিতে অর্পণ করার অনুভবটিও ঋগ্বেদের সময়ের নয়। ঋগ্বেদ রচনার সময় আর্যদের জাতিবিভাগ ছিল না। Dr. John Muir (1810-1882) তাঁর *Original Sanskrit Text* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: 'It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was leargly developed,…penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rite and familiar with all its details the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profamity to epresent the supreme purusha himself as forming the victim.' ঋগ্বেদের পুরুষ সুক্ত অনেক পরের ব্রাহ্মণ্য সংযোজন বলে কঙ্কর সিংহ (১৯৩৮-) তাঁর *আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন* গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

৫. *রামায়ণ*, *মহাভারত* এবং *গীতায়* বর্ণসঙ্কর বিষয়ে উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এক বর্ণের পুরুষ বা নারী অন্য বর্ণের পুরুষ বা নারীর সাথে মিলিত হয়ে এইরূপ সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি করেছিলো। সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকরা এইসকল সঙ্করবর্ণকে নির্দিষ্ট বর্ণে রূপান্তরিত করার চেষ্টাও করেছিলেন। অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য(১৯২১-২০১৪) *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য* গ্রন্থে বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন: 'ঐতিহাসিকভাবে চারশ বছরের বেশি কাল-সীমার মধ্যে পাঁচ ছ'টি বিদেশী আক্রমণ ঘটে এবং অনিবার্যভাবে বর্ণসংকরেরও বিস্তার ঘটে, যার দ্বারা ধীরে ধীরে বৈদেশিকরা সমাজ জীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রথমে শূদ্র রূপে ও পরে ক্ষত্রিয় রূপে। দ্বিতীয়ত, বর্ণসংকর ঘটলে ঐ চতুর্বর্ণের পরিচ্ছন্ন একটা ছক, শাস্ত্রে যা চলে আসছিল, সেটা এলোমেলো হয়ে যায়, সমাজপতিদের মিশ্রবর্ণ সম্বন্ধে নতুন আইন তৈরী করতে হয়, ক্রমে ক্রমে তা করতে বাধ্যও হয়েছিলেন তাঁরা। তৃতীয়ত, বৃত্তিভেদ অনুসারে বর্ণ ক্রমেই বহু বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল এবং যাচ্ছিল। তার ওপরে বিদেশী জাতির সঙ্গে মিলনে আরও বহুধা-বিভক্ত সমাজের ছক নির্মাণ ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। চতুর্থত, বিদেশীদের প্রথমে শূদ্র বললেও যেহেতু তাঁরা বিজেতা এবং শক্তিমান, তাই ধীরে ধীরে তাঁরা ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত হলেন। এই যে উচ্চতর বর্ণে অধিরোহণ, এটা শাস্ত্রকারদের কাছে অগ্রাহ্য মনে হয়েছিল।'

—সুকুমারী ভট্টাচার্য (২০১১), *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৫৬; এছাড়া ব্রাহ্মণ্য সমাজ গঠনে বর্ণসংকর বিষয়ে কঙ্কর সিংহের (২০১৫) *আমি শূদ্র আমি মন্ত্রহীন* গ্রন্থেও এরূপ মত ব্যক্ত করতে দেখা যায়।

আবার উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণে পতিত হয়ে ব্রাত্যজনে পরিণত হওয়ার ইতিহাসও দেখা যায়। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে এ নিয়ে রয়েছে নানারকম বিতর্ক। *রামায়ণ মহাভারতের* আগের রচনা। *রামায়ণে*ও শূদ্রদের নিষ্পেষিত হওয়ার চিত্র দেখা যায়। রামচন্দ্র হত্যা করেছিলেন শূদ্র শম্বুককে। শম্বুককে হত্যা করার পরে রামচন্দ্রের ওপর স্বর্গের দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। দেবতারা বলেছিলেন: "রাম তুমি দেবতাদের কার্য সাধন করলে। তোমার জন্য এই শূদ্র স্বর্গভাক হতে পারলো না।" (শর্মা ২০০৩: ১৪)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, শূদ্রদের স্থান ভারতীয় সমাজে যেমন মর্যাদাকর নয়, তেমনই নয় স্বর্গেও। *বেদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* এবং *গীতায়* চতুর্বর্ণের উল্লেখ রয়েছে। রয়েছে নিম্নবর্ণ শূদ্রদের দলিত হওয়ার কথা। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে বর্ণভেদের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে মনুসংহিতায়। মনুসংহিতা হিন্দুধর্মের বর্ণব্যবস্থার সমর্থনে সবচেয়ে আলোচিত এবং আলোড়িত গ্রন্থ। হাজার বছরেও সেই আলোড়ন শেষ হয়ে যায়নি। ভারতীয় হিন্দু সমাজে মনুসংহিতার প্রভাব বিস্ময়কর। মনু বর্ণব্যবস্থাকে তাত্ত্বিকরূপ দিয়ে কঠোরতর সব বিধান দিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গক্রমে মনুর দুইটি উক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- কেনা হোক বা না হোক, শূদ্রকে দাসে পরিণত করা হবে কারণ ব্রাহ্মণদের সেবা করার জন্য ব্রহ্মা তার সৃষ্টি করেছেন। শূদ্রকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে না, কারণ দাস্য তার স্বভাব। (দত্ত ২০১৭: ২১৪); (মনুর শ্লোক: ৮/৪১৩, ৮/৪১)
- একজন শূদ্র ভৃত্যের শক্তি, দক্ষতা ও পোষ্যের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপযুক্ত ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা উচিৎ। তাকে দেওয়া উচিৎ উচ্ছিষ্ট খাদ্য, অসার ধান, জীর্ণ বস্ত্র ও পুরাতন শয্যা। (দত্ত ২০১৭: ২৫৭); (মনুর শ্লোক: ১০/১২৪, ১০/১২৫)

নৃতত্ত্ববিদদের ধারণা, শূদ্ররা জন্মান্তর ও বৃত্তির নিরিখে বর্ণপ্রথা সৃষ্টির প্রথম থেকেই অন্ত্যজ শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিলো। দলিত শ্রেণিও শূদ্র তথা অন্ত্যজ শ্রেণির অংশবিশেষ। শূদ্র, ব্রাত্য, দলিত আর অন্ত্যজ শ্রেণি হচ্ছে ভারতীয় সমাজব্যাবস্থার নিম্নবর্ণ। এই প্রত্যয়গত ধারণায় *রাক্ষুসী* গল্পের সকল চরিত্রকে নিম্নবর্গীয় হিসেবে সনাক্ত করা যায়; কেননা এ গল্পের সকল চরিত্রই বাগদী এবং তারা নিম্নবর্ণীয় শূদ্রজাত।

লক্ষণীয় যে, বর্ণাশ্রম ভিত্তিক ভারতীয় হিন্দু সমাজব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় মুসলিম শাসনামলে বর্ণ বিভাজনের ধারাও প্রকট হতে দেখা যায়। বর্গ বিভাজনের যে ধারা মুসলমান সমাজে বিস্তৃত হয়ে ওঠে তাকে ইতিহাসবেত্তারা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। মুসলমান সমাজের বর্গগুলো যথাক্রমে: আশরাফ, শরীফ ও আতরাফ। 'আশরাফ'কে চিহ্নিত করা হয়েছে উচ্চবর্ণ হিসেবে, 'শরীফ' হচ্ছে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণি আর 'আতরাফ' শূদ্র-সাদৃশ্য। (পান্না ১৯৮৫: ১০৬) তবে *অগ্নি-গিরি*র রচনাকালে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৭, খ্রিষ্টাব্দ ১৯৩০) বাংলাদেশে 'আশরাফ', 'শরীফ' কিংবা 'আতরাফ'-এর মতো বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা ছিল কিনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎকালে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক বৈষম্য দৃষ্ট হলেও মুসলমানদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের বর্গবিভাজন এ অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায়নি বলে সমালোচক মত প্রকাশ করেন। (আলি ২০০৪: ১৯৯) কাজেই *অগ্নি-গিরি*র চরিত্রদের জন্মগত ও ধর্মীয় বিবেচনায় নিম্নবর্গ বলা সঙ্গত হয় না। উল্লেখ্য *অগ্নি-গিরি* গল্পের সকল চরিত্রই ধর্মীয় বিভাজনে ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তবে বৃত্তির বিবেচনা এখানেও প্রাসঙ্গিক, কেননা অর্থনৈতিক কাঠামোয় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী নিম্নবর্গের অন্তর্ভূক্ত। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নবর্গ সম্বন্ধীয় তত্ত্বে ফিরে তাকানো যেতে পারে।

সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠীর গবেষকবৃন্দ নিম্নবর্গের ধারণাটি নিয়েছেন আন্তোনিও গ্রামশির (Antonio Gramsci: 1891-1937) *The Prison Notebooks*-গ্রন্থ থেকে। এ গ্রন্থে ইতালীয় সুবলতের্নো (subalterno) শব্দটির ইংরেজি করা হয় সাব-অল্টার্ন (subaltern)। ইংরেজি ভাষায় এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ ক্যাপ্টেনের অধস্তন কর্মকর্তা। মার্ক্সবাদী দার্শনিক গ্রামশি *দ্য প্রিজন নোটবুকস্*-এর Notes on Italian History অধ্যায়ের History of the Subaltern Classes: Methodological Criteria পরিচ্ছেদে সাব-অল্টার্ন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ছয়টি ক্ষেত্র বিবেচনায় নিতে বলেছেন। ক্ষেত্রগুলো যথাক্রমে– শ্রেণি, জাতি-বর্ণ সম্প্রদায়, বয়স, লিঙ্গ, কর্মস্থল এবং অন্য কোনো না কোনো ক্ষেত্র। গ্রামশি উক্ত গ্রন্থে সাব-অল্টার্ন চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে হেগেমনিক (*Hegemonic*) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গ্রামশির মতে নন-হেগেমনিক গোষ্ঠীই হচ্ছে নিম্নবর্গ। সমালোচকের অভিমত:

> Non-hegemonic groups or classes are also called by Gramsci "Subordinate" "Subaltern" or sometimes "instrumental". Here again we have preserved Gramsci's original terminology despite the strangeness that some of these words have in English and

> despite the fact that it is difficult to discern any systematic difference in Gramsci's usage between, for instance, Subaltern and Subordinate. (Guha *1986-1995,* 2000: p. xi)

নন-হেগেমনিক বা সাব-অল্টার্ন শ্রেণি আধিপত্যের দিক থেকে অধস্তন, ক্ষমতার বিচারে গুরুত্বহীন ও গৌণ। গ্রামশি হেগেমনির সাহায্যে ডমিন্যান্টের বিপরীতে সাব-অল্টার্নকে চিহ্নিত করেছেন। গ্রামশি পাঠপূর্বক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন: সাব-অল্টার্ন শব্দটি গ্রামশি ব্যবহার করেছেন দুটি অর্থে। প্রথমত প্রলেতারিয়েট (proletariat)-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সরাসরি ব্যবহার করেছেন সাব-অল্টার্ন। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন সাব-অল্টার্ন হিসেবে। দ্বিতীয়ত শ্রেণিবিভক্ত সমাজ-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অধস্তন স্তরে থাকা জনগোষ্ঠীকে তিনি সাব-অল্টার্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। (ভদ্র, চট্টোপাধ্যায় ২০১৮: ১০) সরাসরি শ্রমিক শ্রেণির বাইরে দ্বিতীয় যে অর্থে সাব-অল্টার্নের কথা গ্রামশি বলেছেন সেটি সমাজে বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই দ্বিতীয় সাব-অল্টার্ন শ্রেণির খণ্ডাংশ দেখা যায় *অগ্নি-গিরি* গল্পে। এ গল্পে যেসকল চরিত্র রয়েছে তাদের একটি বর্গভিত্তিক তালিকা নিম্নে সারণি আকারে প্রকাশ করা হলো:

সারণি-২

গল্পে উল্লিখিত নিম্নবর্গীয় চরিত্র ও তাদের বয়স	গল্পে উল্লিখিত উচ্চবর্গীয় চরিত্র ও তাদের বয়স	অনুল্লিখিত চরিত্র
আলি নসিব মিঞা (৫০), সবুর আখন্দ (২০), রুস্তম (২২), নুরজাহান (১৬), মৌলবী সাহেব (৪৫), সুশীল নাপিত (২৫), আমির (২২), আমিরের বাবা (৪৫), ডাক্তার (৩৫, দারোগা (৪০), নুরজাহানের মা (৪০), উকিল (৪৫), বিচারক (৫০), রুস্তমের সহযোগী ৪-৫ জন (১৮-২২)	উচ্চবর্গীয় কোন চরিত্র নেই।	বীররামপুর গ্রামবাসী, দারোগার সহকারী, বিচারকার্যের নিমিত্ত কোর্টে উপস্থিত অন্যান্য মানুষ, কারাগারের গেটে দায়িত্ব পালনকারী, প্রমুখ।

বক্ষ্যমাণ গল্পদ্বয়ে নিম্নবর্গের জীবন পর্যালোচনার এ পর্যায়ে জীবনের প্রত্যয়গত ধারণাও বিবেচনায় নেওয়া আবশ্যক। "জীবন" বলতে গল্পে প্রতিফলিত মানুষ, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, সংগ্রাম-সাফল্য এবং ধর্ম-সংস্কৃতি-পেশাকে বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ অস্তিত্বের প্রয়োজনে মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক

পরিচয়ই বর্তমান গবেষণায় "জীবন" হিসেবে বিবেচিত হবে। নির্বাচিত গল্পদ্বয়ে নিম্নবর্গের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দুইটি দিক আমরা পর্যালোচনা করতে পারি:

ক) পেশা ও আর্থসামাজিক পটভূমি
খ) ভাষা ও সংস্কৃতি

ইতঃপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে যে, *রাক্ষুসী* গল্পের সকল চরিত্রই নৃতাত্ত্বিকভাবে বাগদী। বাগদীদের পেশা সম্বন্ধেও আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পে আমরা বাগদীদের একটিমাত্র পরিবারের কথাই স্পষ্টভাবে জানতে পারি। বিন্দির পরিবারের সকলে জীবনযাপনের নিমিত্ত যে পেশাগুলোর আশ্রয় নেয় সেগুলো যথাক্রমে: অন্যের জমি বর্গাচাষ; মাছ ধরা; ধান ভানা; শামুক ধরা; গুগলি সংগ্রহ; শাক ও সবজি চাষ এবং বিক্রয়; অন্যের কাছে শ্রম বিক্রয়, প্রভৃতি। বলা আবশ্যক যে, পেশাগত উপার্জনই জীবীকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন। কাজেই বিন্দি, বিন্দির স্বামী, পাঁচু ও পাঁচুর বোনের উপর্যুক্ত পেশাই নির্দিষ্ট করে দেয় তাদের আর্থসামাজিক পটভূমি। গল্পে বিন্দিকে বলতে শোনা যায়:

> সোয়ামি আর ছেলেগুলোকে দিতুম ভাত, আর নিজে খেতুম মাড়—শুদ্ধ ভাতের ফেণ! মেয়ে মানষের আবার সুখ কি, ছেলেমেয়ে যদি ঠাণ্ডা রইল তাতেই আমাদের জান ঠাণ্ডা! নাইবা হলুম জমিদার। আমরা ত কারুর কাছে ভিক্ষে ক'রতুম না, চুরি-দারিও ক'রতুম না। নিজের মেহনতের পয়সা নেড়ে-চেড়ে খেতুম। নিজে খেতুম, আর পালে রে পার্বণে রে যেমন অবস্থা দু'দশটা অতিথি-ফকিরকেও খাওয়াতুম। আহা, ওতেই ত আমার বুক ভরে ছিল দিদি! (ইসলাম ২০০৯: ১৩২)

উপর্যুক্ত উক্তি থেকে প্রধানত তিনটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, দারিদ্র্য। সাধারনত ভাত রান্নার সময়ে মাড় ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিন্দির পরিবার মাড় না ফেলে তা যত্নে রেখে দেয় খাবার নিমিত্ত। অর্থাৎ ভাতের মাড়ও তাদের আহারের উপাদান। মাড় খাওয়া এখানে কোনরূপ বিলাসিতা কিংবা শখের বশবর্তী হওয়া নয়। সংকট ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মাড়কে করে নেওয়া হয়েছে ভাতের বিকল্প। দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী পরিচয়। ভিক্ষা, চৌর্য কিংবা কোনরূপ অন্যায়সূচক বৃত্তির দ্বারা উপার্জন করে না বিন্দির পরিবার। নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে উপার্জিত অর্থব্যয়ে জীবন অতিবাহিত করে তারা। অর্থাৎ তারা সৎ এবং কোনরূপ অলস নয়। নিজেদের উপার্জনের প্রতি রয়েছে ভক্তি ও অহংকার। তৃতীয়ত, সামাজিক সম্পর্ক বিন্যাস। সামাজিক সম্পর্কের সূত্রে বিভিন্ন উৎসবের সময় অতিথি আপ্যায়নের রীতিও বিন্দির পরিবারে বিদ্যমান। আবার কখনো কখনো অতি দরিদ্রদের প্রতি সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দেয় তারা। কাজেই এ কথা পরিষ্কার হয় যে, বিন্দিরা সমাজবদ্ধ জীবন ভালবাসে। সমাজের সকলের সাথে মিলে মিশে নিজেদের শ্রম ও ঘাম দ্বারা উপার্জন করতে আগ্রহী। নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামজিক পরিবেশ নিয়ে তারা সুখী ভাবতে প্রয়াসী।

পেশা ও আর্থসামাজিক রূপের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় *অগ্নি-গিরি* গল্পের চরিত্রদের ক্রিয়া ও সংলাপে। গল্পের প্রধান চরিত্র সবুর এখনও পূর্ণাঙ্গ কর্মজীবনে প্রবেশ করেনি। কিন্তু আলি নসিব মিঞার বাড়িতে জায়গীর থেকে সে একটি কর্ম করে। নুরজাহানকে উর্দু ভাষা শেখায়। এই শিক্ষা প্রদানের বিনিময়ে তাদের বাড়িতে সবুরের থাকা ও খাবার জোটে। ছাত্রাবস্থায় জায়গীর থেকে অন্যকে শিক্ষা দানের এই ক্রিয়াকে সবুরের পেশা হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আবার রুস্তম ও তার সহযোগী বন্ধুদের পেশা গল্পটিতে স্পষ্ট হয়নি। ধারণা করা যায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যত্র জায়গীর থাকতে পারে। কেউ হয়তো নিজেদের বাড়িতে থাকলেও এখনও ছাত্রাবস্থা সমাপ্ত হয়নি। অন্যতম প্রধান চরিত্র আলি নসবি মিঞা সম্ভ্রান্ত কৃষক। জমিতে ফসল ফলান। চাষাবাদই তার পেশা। আমাদের মনে রাখতে হয়, বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানা মূলত ছিল প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। গল্পে গ্রামের পরিবেশ বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, তৎকালে বীররামপুরে কোন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি। কাজেই গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের পেশা ছিল কৃষি এবং এ সংক্রান্ত ব্যবসা। সম্ভ্রান্ত কৃষকের বাইরে কৃষি পেশায় ছিল শ্রমিকশ্রেণি। ঐতিহাসিকভাবে এ সত্য জানা যায় সমালোচকের নিম্নোক্ত গবেষণালব্ধ উক্তিতে:

> ভারতের তথা বাঙলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপকতা, সন্ত্রাসবাদ, গান্ধীজীর জাতপাত বা হরিজন আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি বা বিপর্যয়, রুশ-বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া সাম্যবাদী আন্দোলন ও কমিউনিস্টদের ঈশ্বর-বিরোধিতা ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত ভূমিকা; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করালছায়া তথা যুদ্ধজনিত জীবনের রূপ ও বিশ্ব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, মন্বন্তর এবং কৃষক-শ্রমিক-আদিবাসী বিক্ষোভ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে গণচেতনা বা জীবনবোধ রূপ লাভ করে, তা আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে সূচনা করল এক নতুন যুগ বা অধ্যায়। সমাজে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য, অপজাত ও অবজ্ঞাত মানুষ চিরকাল দুঃসহ দারিদ্র্য বা আর্থিক সংকট ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি সংগ্রাম করে চলেছে। কেবল অন্নসংস্থান হেতু সমাজের নিম্নবর্গের যে-কোন বৃত্তি গ্রহণে সংকোচ বা দ্বিধাবোধ বিষয়টি সামাজিক মর্মমূলে প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। বিশ শতকে আকণ্ঠ দারিদ্র্য-জর্জর কামার, কুমোর, চামার (মুচি), ছুতোর প্রভৃতি সমাজের নিচের তলার লোকেরা স্ব-স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করে নির্দ্বিধায় শিল্প ও কৃষিতে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করে জীবিকা অর্জন করে, এমনকি গাঁ-গঞ্জের দরিদ্র ব্রাহ্মণেরা ও তাদের যজমান বা কৌলিকবৃত্তি পরিত্যাগ করে শিল্প ও কৃষিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে নি। সাহিত্যে এতদিন যারা অপাঙক্তেয় ছিল, বিশশতকে সেই অবজ্ঞাত নিম্নবর্গ ব্রাত্যসম্প্রদায় সাহিত্যের আসনে ভিড় করে এলো। (দেবসেন ১৯৯৯: ৬৪)

কাজেই এ কথা স্পষ্ট হয় যে, ভারতবর্ষ ও তৎপরবর্তী পাকিস্তানধীন বাংলায় নানারকম পেশাজীবী মানুষ সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। *অগ্নি-গিরি* গল্পে এই কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। গল্পের আলি নসিব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে "ত্রিশাল থানার সমস্ত পাটের পাটোয়ারি তিনি"। (ইসলাম ২০০৯: ১৯৭) পাট উৎপাদন ও পাট ব্যবসায় আলি নসিবের পেশা। উকিলের ওকালতি, দারোগার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত কর্ম এবং বিচারকের বিচার কার্য

পরিচালনা প্রভৃতি পেশার উল্লেখ গল্পটিতে পরিলক্ষিত হলেও তা বীররামপুর গ্রামবাসীর কিংবা প্রধান চরিত্রদ্বয়ের নয়। কাজেই জায়গীরের শিক্ষা প্রদান এবং কৃষিই এ গল্পস্থিত চরিত্রের প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচ্য। এ পেশাকে বিবেচনায় নিলে সহজেই সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিমাপ করা যায়। আলি নসিবের পরিবারে রয়েছে সচ্ছল জীবন, অপরদিকে সবুর দরিদ্র। গল্পে উল্লেখিত হয়েছে: "গরীব শরীফ ঘরের ছেলে দেখে আলি নসিব মিঞা সবুরকে বাড়িতে রেখে তার পড়ার সমস্ত খরচ যোগান।" (ইসলাম ২০০৯: ১৯৭)

ভাষা ও সংস্কৃতি নিম্নবর্গ সনাক্তকরণে অন্যতম মূখ্য ভূমিকা পালন করে। আন্তনিও গ্রামশি সাব-অল্টার্নদের ভাষা ও সংস্কৃতি গভীরভাবে পাঠ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। *রাক্ষুসী* গল্পে যে ভাষা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা কোনক্রমেই শহরের শিক্ষিত রুচিশীল মানুষের মার্জিত ভাষা নয়। *রাক্ষুসী*র সমস্ত অংশ জুড়েই রয়েছে আঞ্চলিক ভাষার ছাপ। অবশ্য কেবল আঞ্চলিকতা দিয়েও *রাক্ষুসী*র ভাষা বিচার করা চলে না। ভৌগলিক অবস্থানভেদে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীরই রয়েছে নিজস্ব অঞ্চলভিত্তিক ভাষা। বাগদীদের ভাষা একেবারেই স্বতন্ত্র। সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া, ধাঙড় কিংবা ডোমদেরও রয়েছে অঞ্চলভিত্তিক ভাষা বৈচিত্র্য। এ সকল জাতি-গোষ্ঠীর সাথে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাগদীদের কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ভাষা অনেকটা পৃথক। শব্দের উচ্চারণ ও শারীরিক অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাষার প্রকাশে এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে *রাক্ষুসী* গল্পে বিন্দি উচ্চারিত কিছু শব্দের উদাহরণ নিম্নে সারণি আকারে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৩

গল্পে বয়ানকৃত শব্দ	**প্রমিত শব্দ**
সোয়ামি	স্বামী
সোয়ামিক	স্বামীকে
ফের	আবার
পেতেছিলুম	পেতেছিলাম
করলে	করলো
কর্‌তুম	করতাম
দুখ্‌খুর	দুঃখ
বুন্‌	বোন
ফেণ	মাড়
লুন	লবন

শাগ	শাক
কির্‌ষাণি	কৃষাণী
ইস্ত্রি	স্ত্রী
পেত্থম	প্রথম
শুন্‌লুম	শুনলাম
মিন্‌সে	স্বামী
দেখলুম	দেখলাম
বাক্‌স	বাক্স
ভদ্দরনুক	ভদ্রলোক
নাথি	লাথি
নিঘ্‌ঘাত	নির্ঘাত

শব্দের উপর্যুক্ত উচ্চরণভঙ্গি জানান দেয় বাগদীদের ভাষারীতির স্বাতন্ত্র্য। এর সাথে নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে কিছু শব্দের ব্যবহার যা বাগদীদের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এইরূপ কিছু শব্দ নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

সারণি-৪

গল্পে বয়ানকৃত শব্দ	**যে অর্থে শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে**
মাগী	নারীর প্রতি গালিবিশেষ।
মিনসে	স্বামী
স্যাঙ্গা	নিকাহ
কড়ুই রাঁড়ী	বালবিধবার উদ্দেশে তিরস্কারসূচক সম্বোধন।
ছুঁড়ি	অবিবাহিত যুবতী
গঞ্জনা	লাঞ্ছনা
মড়কচণ্ডি	মহামারির চূড়ান্ত রূপ/মহামারির দেবী
ছুঁতো	অজুহাত
ডাইনী	মানুষখেকো
শাপমন্যি	অভিশাপ।
লণ্ডভণ্ড	ধ্বংস
বৌ	বউ

বেটা	প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ।
ছ্যাঁকা	আঘাত
ঘরকন্না	ঘর-সংসার
সচল বচল	উত্তমরূপে
ছোকরা	ছেলে

উপর্যুক্ত শব্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগ উচ্চবর্গের সমাজে প্রায় কল্পনাতীত। অথচ নিম্নবর্গের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় এইসব সম্পূর্ণতই মানানসই। কেননা ইতঃপূর্বে ব্যক্ত সাব-অল্টার্নের তত্ত্বানুযায়ী আমরা জানি, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে থাকে নিম্নবর্গ। ফলত তাদের পেশা হয়ে ওঠে শ্রম নির্ভর, রুচি হয় শহুরে মার্জিত রূপের বিপরীত। তাছাড়া যে সংস্কৃতি নিম্নবর্গ বহন করে তা নির্মিত হয় দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানাবিধ ক্রিয়া হতে। *রাক্ষুসী* গল্পের ভাষা ও সংস্কৃতি তাই বাগদীদের নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ থেকে উদ্ভূত। বাগদী সংস্কৃতির আরেকটি ধরন প্রত্যক্ষ করা যায় গল্পের অন্যত্র। গল্পে বিন্দি তার স্বামী সম্বন্ধে বলে:

> ওর আর একটা বদ্-অভ্যেস ছিল, ও বড্ড মদ খেত। কতদিন বলেছি, 'তুমি মদ খাও ক্ষতি নাই, দেখো তোমায় মদে যেন না খায়!' কিন্তু সে তা শুন্‌ত না; একটু ফাঁক পেলেই যা রোজগার কর্‌ত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আস্‌ত। যাক, ওরকম দুচারটে বদ্-অভ্যেস পুরুষ মানুষের থাকেই থাকে...। (ইসলাম ২০০৯: ১৩৩)

সস্তা মদ খাওয়া কোন কোন নিম্নবিত্ত সমাজের সংস্কৃতির একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত। ডোম, ধাঙড়, বাগদী, সাঁওতাল, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ে এরূপ রীতি প্রচলিত রয়েছে বলে সমালোচক অভিমত পোষণ করেছেন। (ঘোষ ২০০৬: ৫৩, ৭২, ৯০) কাজেই সারাদিন কাজ শেষে উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ দিয়ে বিন্দির স্বামীর মদ খাওয়ার অভ্যাস তার সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অগ্নি-গিরি গল্পে ত্রিশাল অঞ্চলের গ্রামস্থিত গণমানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। শব্দের উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গির যে বর্ণনা গল্পে পাওয়া যায় তার দরুণ সহজেই উপর্যুক্ত বক্তব্য প্রমাণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ এ গল্পের চরিত্রদের ব্যবহৃত কিছু শব্দের উচ্চারণের ধরণ নিম্নোক্ত সারণি আকারে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-৫

গল্পে বয়ানকৃত শব্দ	**যে অর্থে শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে**
ইবলিশা	শয়তান
পোলাপান	দুষ্টু ছেলের দল

বেডি	মেয়ে
বিজাত্যা	বেয়াদব
জওয়াব	জবাব
ভলাইছিলেন	ভুলিয়েছিলেন
খুঁইজ্যা	খুঁজে
লইবাম	নিব
দিবাম	দিব
কইয়্যা	বলে
বইয়্যা	বসে
কইবেন	উলবেন
মাইর‍্যা	মেরে
হ্যানে	স্থানে
তাইনোসেন্	তা না হলে
খাইব্যাম	খাব

অঞ্চলভিত্তিক শব্দ উচ্চারণের এইরূপ প্রবণতা সমাজের প্রান্ত সীমায় বসবাস করা অন্ত্যজ মানুষের মধ্যেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। কেননা এদের শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, পেশা-পরিচয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা, পোশাক ও রূপসজ্জা, শখ, রুচি প্রভৃতি নগরের শিক্ষিত নাগরিক শ্রেণির মতো নয়। আবার ক্ষমতার কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে যে গোষ্ঠী তাদের মতোও নয়। কাজেই প্রকৃতি প্রদত্ত পরিবেশে নিজস্ব বোধ আর ভাললাগা কিংবা মন্দলাগার ভিত্তিতে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মিত হয়। *অগ্নি-গিরির* চরিত্রদের শব্দ উচ্চারণ ও ব্যবহারের ধরন তাই জীবনঘনিষ্ঠ। একই কথা প্রযোজ্য *রাক্ষুসীর* বাগদীদের ভাষা সম্বন্ধেও। তবে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, *রাক্ষুসীর* বাগদীগণ আর *অগ্নি-গিরির* গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগণ—সকলে নিম্নবর্গের হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাষার মধ্যে যেমন রয়েছে সাদৃশ্য তেমনই বৈসাদৃশ্যও। বাগদীরা যে রূপ গালি ব্যবহার করেছে তা *অগ্নি-গিরির* চরিত্রদের মধ্যে দেখা যায়নি। এই বৈসাদৃশ্য আমাদের ইঙ্গিত দিয়ে যায় যে, নিম্নবর্গেরও রয়েছে স্তর বিন্যাস।

> গ্রামে বসবাসকারী নিম্নবর্গীয় মানুষ যেহেতু মাটি, গাছ, নদী, খাল, বিল, পশু, পাখিসহ প্রকৃতির নানাবিধ অনুষঙ্গের সান্নিধ্য পায় সেহেতু তারা অনেকক্ষেত্রে স্বভাবজাত কল্পনাবিলাসী ও রসিকজনে পরিণত হয়। এ কারণে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা অতি মাত্রায় জ্বিন-ভুতে বিশ্বাসী হয়, নানারকম সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে; আবার ভাব বিনিময়ে আশ্রয় নেয় প্রবাদ-প্রবচনের। নির্বাচিত গল্পদ্বয়ের নিম্নবর্গকে দেখা গেছে স্ব স্ব ধর্মীয় বিশ্বাসে অটুট

থাকতে। উভয় গল্পের চরিত্ররা প্রবচনের ব্যবহার করেছে। *রাক্ষুসী* গল্পে বিন্দিকে বলতে শোনা যায় 'স্বভাব যায় না মলে'; 'রোদে রোদে বিষ্টি হয়, খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়' প্রভৃতি প্রবচন। (ইসলাম ২০০৯: ১৩৩, ১৩৬)

আবার *অগ্নি-গিরি*তে রুস্তম ও তার সহযোগী বন্ধুরা প্রতিনিয়ত যে ছড়া রচনা করে তা নিম্নবর্গের নান্দনিক চেতনার একরূপ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। সবুরকে বিরক্তি করার নিমিত্ত রুস্তমের দল বলে:

প্যাঁচা, একবার খ্যাচ্‌খ্যাচাও
গর্ত থাইক্যা ফুচ্‌কি দাও
মুচ্‌কি হাইস্যা কও কথা
প্যাঁচারে মোর খাও মাথা!
(ইসলাম ২০০৯: ১৯৯)

লক্ষণীয় যে, একই সম্প্রদায়ের কোন কোন মানুষের কাছে *সবুর* হয়ে গেছে *প্যাঁচা*, *রুস্তম* হয়ে গেছে *রুস্তম্যা* আবার *ফজল* হয়েছে *ফজল্যা*। নামের বিকৃত রূপ বিকশিত করার এইরূপ রীতি অনুন্নত গ্রামীণ নিম্নবর্গীয় সমাজ বাস্তবতারই একটা অংশবিশেষ। যেমন জীবনের একটা মাত্র ঘটনার দরুণ সমাজে বিন্দি হয়ে উঠেছে *ডাইনী* ও *রাক্ষুসী*। একইরূপ সমাজে পরস্পরের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এইরূপ দোলাচল, কখনও সম্প্রীতি, কখনওবা হাঙ্গামা নিম্নবর্গের সমাজ ও জীবন-বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, নির্বাচিত গল্পদ্বয়ে উচ্চবর্গের উপস্থিতি নেই, কাজেই বর্গের দ্বান্দ্বিকতাও অনুপস্থিত। গ্রামশির হেগেমনি বা আধিপত্যবাদী (dominant) দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব নির্বাচিত গল্পদ্বয়ের নিম্নবর্গের ওপর তাই নেই বললেই চলে। অবশ্য আর্থসামাজিকতায় পিছিয়ে থাকা যে নিম্নবর্গকে সনাক্ত করতে চেয়েছেন গ্রামশি তা এখানে বিদ্যমান। আবার রণজিৎ গুহের নেতৃত্বে সাব-অল্টার্ন স্টাডিজ গোষ্ঠী উৎপাদন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে হেগেমনি তত্ত্বের বিস্তার ঘটিয়েছেন সেই সম্পর্কসূত্রও এখানে প্রকট নয়। কেননা মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব এখানে নেই। শ্রম নির্ভর পেশার উপস্থিতি থাকলেও নেই সরাসরি শ্রমিক শ্রেণির বঞ্চনার ইতিহাস। মূলত এ গল্পদ্বয়ে উপস্থিত হয়েছে ভিন্ন দুটি সম্প্রদায়ের অন্ত্যজ মানুষের নিত্যকার জীবনাচরণের খণ্ড চিত্র। তাদের ভাললাগা, মন্দলাগা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম, দুষ্টুমি, বেঁচে থাকার সংগ্রাম এ গল্পদ্বয়ের প্রাণ। আমরা জানি ছোটগল্প হতে হলে অল্প কথায় অধিক ভাব ব্যক্ত করতে হয়। বিন্দুতে সিন্ধুর বিশালতা থাকলে তবেই হয়ে ওঠে এ শিল্প। ছোটগল্পে থাকে ভাবের ব্যাপকতা। কাজেই কোন জাতি-গোষ্ঠীর দীর্ঘকালের জীবন ও সংস্কৃতিচিত্রের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপন বেশ দুরূহ। তথাপি *রাক্ষুসী* ও *অগ্নি-গিরি* গল্পদ্বয় হতে আমরা নিম্নবর্গকে কিছুটা হলেও ভিন্ন মাত্রায় উপলব্ধি করতে সমর্থ হই। এখানে বিনির্মিত নিম্নবর্গের জীবন অতিবাহিত হয়েছে সামষ্টিক চেতনা ও সম্পর্কের বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। সমাজের অন্ত্যজ বাঙালি

ও বাগদী সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতির যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য কাল পরম্পরায় বহমান তারই কিয়দংশ শৈল্পিক বাস্তবতায় এখানে মূর্ত হয়েছে। ফলত গল্পে বিনির্মিত নিম্নবর্গীয় জীবনাচারের শিল্পসত্যকে বাস্তব সত্যের খণ্ডাংশ হিসেবে বিবেচনা করা দরকার।

তথ্যসূত্র

আহমদ, শরীফ (২০০৭)। *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (সম্পাদক: আহমদ শরীফ) বাংলা একাডেমী, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা।

আলি, এ. এফ. ইমাম (২০০৪)। *সামাজিক অসমতা* ইনস্টিটিউট অব অ্যাপলায়েড অ্যানথ্রোপলজি, ঢাকা।

ইসলাম, কাজী নজরুল (২০০৯)। *নজরুলের ছোটগল্প সমগ্র*, নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ, প্রথম ও নবম মুদ্রণ, ঢাকা।

ইসলাম, কাজী নজরুল (২০১১)। *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ইসলাম, সিরাজুল (২০০৩)। *বাংলাপিডিয়া*, (সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

ঈন্না, মুস্তফা (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ঘোষ, শৌরীন্দ্রকুমার (২০০৬)। *বাঙালি জাতি পরিচয়*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ভারত।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (২০১৮)। *ভূমিকা: নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস*, (সম্পাদক: গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়), *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, ভারত।

চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ (২০১২)। *বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ভারত।

দত্ত, চৈতালী (২০১৭)। *মনুসংহিতা*, (সম্পাদক: চৈতালী দত্ত), নবপত্র প্রকাশন, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ভারত।

দত্ত, রমেশ চন্দ্র (২০০৭)। *ঋগ্বেদ সংহিতা*, (অনুবাদক: রমেশ চন্দ্র দত্ত), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-০৭।

দেবসেন, সুবোধ (১৯৯৯)। *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ভারত।

বসু, রাজশেখর (২০০৯)। *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত*, (অনুবাদ: রাজশেখর বসু), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

বড়ুয়া, লিপিকা রাণী (২০১৯)। *মালপাহাড়ি ও বাগদি জাতির আদ্যোপান্ত*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ভারত।

বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেট (১৯৯৬)। বীরভূম, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার, ভারত।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী (২০১১)। *প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভারত।

শর্মা, রামশরণ (২০১৩)। *প্রাচীন ভারতে শূদ্র*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ভারত।

শাহিদ, শাহিদুর রহমান (২০০১)। *বাগদি ও মাহলপাহাড়ি প্রসঙ্গে*, (সম্পাদক: শাহিদুর রহমান শাহিদ), ডেইলি বাংলাদেশ, ঢাকা, ২৮ জানুয়ারী।

শাস্ত্রী, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য (২০১৬)। *মহাভারতের সমাজ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভারত।

সিংহ, কঙ্কর (২০১৫)। *আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ভারত।

Connell, Raewyn (2007). *Southern theory: The global dynamics of knowledge in social science*, Polity Press, Cambridge.

Guha, Ranajit (2000). *A Subaltern Studies Reader 1986-1995*, (Editor: Ranajit Guha), Oxford University Pres, New Delhi, India.

Guha, Ranajit (1987). *Subaltern Studies: Capital, Class and Community* by Asok Sen, (Editor: Ranajit Guha), *Subaltern Studies*, Vol-5, Oxford University Press, Delhi.

Muir, Dr. John (2014). *Original Sanskrit Text*, Repressed Publishing, New Delhi, India.

অভিধান ও কোষগ্রন্থ

Bangla Academy English-Bengali Dictionary (2008)

Concise Oxford English Dictionary (1999)

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (2000)

The New Samsad English Bengali Dictionary (2001)